# টোটোপাড়ায়, টোটোদের মধ্যে :

## জনজাতির জীবন ও 'আধুনিকতা'-র অভিঘাত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

মাতৃভাষা

**বিপ্লব নায়ক**

### প্রবেশ কথা

অদ্ভুত সমাপতন। হাসিমারা স্টেশন থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট যাওয়ার বাসে উঠতেই দেখা হয়ে গেল ধনীরাম টোটোর সঙ্গে। ধনীরাম টোটোকেই আমরা ফোন করছিলাম বাসে ওঠার আগে। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসংগ্রহের কাজে টোটোপাড়া ঘুরে যাওয়া আমাদের এক বন্ধু কলকাতাতেই ধনীরাম টোটোর ফোন নাম্বার আমাদের দিয়ে বলেছিল যে ইনিই টোটোপাড়ায় আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভারতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনজাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল টোটোরা। তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে তারা গোটা ভারতের মধ্যে কেবল এই জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তের টোটোপাড়াতেই বাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে। আমরা পাঁচ বন্ধু— সমীর, সৌম্য, ওয়াসিম, অরিজিত আর আমি—যখন এঁদের মধ্যে কিছুদিন কাটিয়ে এঁদের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করা মনস্থ করলাম, তখন প্রাথমিক অপরিচয় ও জড়তা কাটানোর জন্য আমাদের আশা-ভরসা ছিলেন ধনীরাম টোটোর মতো কয়েকটি নাম—যাঁদের সঙ্গে তখনও আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়নি।

মাদারিহাটগামী আঞ্চলিক মানুষজনে ভর্তি বাসে পিঠে বড়ো ঝোলা নিয়ে কয়েকজন অন্য চেহারার লোক দেখে ধনীরামই আমাদের চিনে নিলেন। ডেকে বললেন, আপনারাই কলকাতা থেকে আসছেন তো, আমিই ধনীরাম টোটো।

ধনীরাম টোটোর বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁর আচরণভঙ্গি তরতাজা আমুদে এক যুবকের মতো। সদ্য পরিচিতকে একটানে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। তাই অপরিচয়ের গণ্ডী বেমালুম উবে গিয়ে বাস থেকে নামার আগেই তিনি আমাদের 'ধনীরামদা' হয়ে গেলেন।

মাদারিহাটে নেমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, টোটোপাড়ায় যাওয়ার জিপগাড়ি ভাড়ার বন্দোবস্ত করা—সব দায়িত্বই ধনীরামদা সামলালেন, যেন, এমনটাই তো হওয়ার কথা! জিপগাড়ি যখন মাদারিহাট ছেড়ে রওনা হল, তখন তাতে সওয়ার আমরা পাঁচজন, ধনীরাম টোটো আর টোটোপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা ও দুই শিশু। তখন মাঝদুপুর। মাদারিহাট ছাড়িয়ে একটা নদীখাত পেরিয়ে অপর পাড়ে উঠতেই হইহই ডাকে জিপ থেমে গেল। ধনীরামদা জিপ থেকে নেমে এক মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন—বোঝা গেল যে ইনি ধনীরামদার বউ, বাজার করা ও অন্যান্য কাজে এখানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ কিছু স্থানীয় যুবক-যুবতী—তাদের মধ্যে অনেকে স্কুলের পোশাক পরা, স্কুল থেকে ফিরছে। তারা সবাই ফেরার গাড়ির অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল যে জিপের ভিতরে বসে এই অনিন্দসুন্দর যাত্রাপথকে ঠিকমতো ইন্দ্রিয়ানুভূতিগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না—তাই এই সুযোগে আমরা পাঁচজন চটপট জিপের ভিতর থেকে বেরিয়ে জিপের ছাদে চড়ে বসলাম। আরও কয়েকজন স্থানীয় যুবকও আমাদের সঙ্গে ছাদে উঠল, আর বারো-তেরোজন মেয়ে ও মহিলা ঠাসাঠাসি করে উঠল জিপের ভিতরে।

স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে টুকিটাকি কথা বলতে বলতে জিপের মাথায় চড়ে আমরা পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। দুপাশে চা-বাগান, মাঝেমধ্যে ছোটো লোকালয়। তারপর থেকে শুধুই জঙ্গল, একের পর এক নদীখাত। মসৃণ পিচরাস্তা ছেড়ে পথ এখন নুড়ি-পাথর-গাছের শিকড়ের উপর দিয়ে টালমাটাল। নদীখাতগুলোর উপরে কোনও সেতু নেই। নদীখাতে নেমে এসে ঝিরিঝিরি জলধারার উপর দিয়েই তা পেরোতে হয়। এখন গ্রীষ্মমাসের এই ঝিরিঝিরি স্রোত বর্ষায় ফুলে ফেঁপে প্রায় অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে, মাঝেমধ্যেই ছুটে চলে হড়পা বানের দুর্দম রূপে।

হাওড়ি নদীর বিস্তীর্ণ নদীখাত পেরোতেই ভুটান সীমান্তের শেষ পাহাড়ের দক্ষিণ কোল। এই কোলেই টোটোপাড়া। টোটোপাড়ায় ঢুকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে সরকারি আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর, গ্রামীণ ব্যাংক, সীমারক্ষীবাহিনীর ছাউনি এইসব ফেলে এসে জিপ দাঁড়াল টোটোপাড়ার বাজার এলাকায়। বেশিরভাগ যাত্রী এখানে নেমে গেল। ধনীরামদাও নেমে গেলেন। ওখানেই অপেক্ষা করছিল উদয় টোটো—ধনীরামদা তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে গেলেন যে উদয়ই আমাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে

দেবে, অন্যান্য বন্দোবস্তও করে দেবে—আর তিনি নিজে আবার সন্ধ্যাবেলা আসবেন। উদয় টোটো জিপে উঠে বসল। জিপ আরও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আমাদের নামাল পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা এক মাঠের ধারে। সেই মাঠে টোটোদের পুরানো প্রথার বাড়িঘর—অর্থাৎ মাটির থেকে কিছুটা উপরে তৈরি মাচার উপর একটা ঘর ও প্রশস্ত বারান্দা নিয়ে তৈরি বাঁশ ও কাঠের বাড়ির—একটা ধাঁচা তৈরি করা আছে। আর তার পাশেই আধুনিক তিন কামরার এক পাকা বাড়ি—টোটোদের নিজেদের গড়া 'টোটো কল্যাণ সমিতি'-র তৈরি অতিথিনিবাস। আমাদের সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলল উদয় টোটো। আমরা থিতু হতে হতে সে চাল, আলু, ডিম, তেল-ও কিনে নিয়ে চলে এল যাতে আমরা নিজেদের খাবার রান্না করে নিতে পারি। ধনীরামদার মতো বাংলায় সে অনর্গল নয়। ভাঙাচোরা বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে টোটোপাড়া সম্পর্কে প্রাথমিক নানাকিছু জানা গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে—উদয় টোটো সেইদিনের মতো বিদায় নিয়ে তার নিজের বাড়ির পথ ধরল।

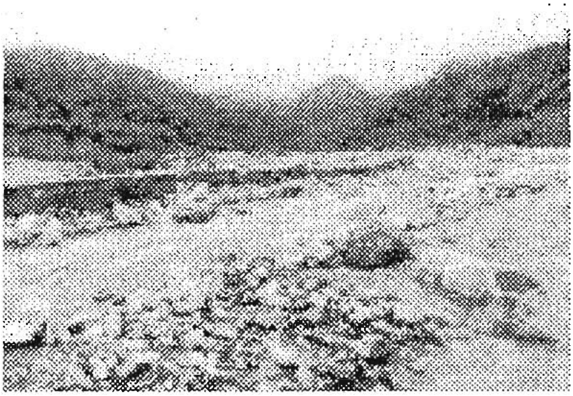

হাওড়ি নদীখাত, তার ওপারে মেঘে ঢাকা টোটোপাড়ার পাহাড়। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

গোল বাধল রাতের খাওয়ার জন্য রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে ভাত চাপাতে গিয়ে। দেখা গেল যে সিলিন্ডারে গ্যাস নেই। রাত তখন ন'টা হবে। টোটোপাড়ায় নেমে এসেছে অন্ধকার। পাহাড় ও জঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শহরে মেলে না। মনে হল যে টোটোপাড়ায় প্রথম রাত অনশনেই কাটাতে হবে। তবু একবার ধনীরামদাকে ফোন করা হল। ফোন পেয়েই ধনীরামদা বললেন যে ভাবনার কোনও কারণ নেই, একটা ব্যবস্থা তিনি তখনই করছেন। ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে। মোমবাতির আলো চারপাশের অন্ধকারকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে। ধনীরামদা একটা ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পড়শি রূপচাঁদ টোটোর বাড়ি থেকে তাদের বাড়ির রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার খুলে নিয়ে তিনি আর রূপচাঁদ নিজেরা তা বয়ে নিয়ে এসে হাজির। বললেন, আজ এই কাঁচা ব্যবস্থায় চালান, কাল সকালে পাকা ব্যবস্থা করা যাবে। রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার লাগিয়ে দিয়ে তিনি আর রূপচাঁদ আমাদের সঙ্গে আড্ডায় বসে গেলেন। রূপচাঁদের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। টোটোপাড়ার নানা কাজে দক্ষসংগঠক হওয়া ছাড়াও সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে—টোটোপাড়ায় এইটি একটি বিরল গুণ কারণ টোটোদের সংস্কৃতিতে চিত্রশিল্পের কোনও পরম্পরা নেই। কথায় কথায় রাত বারোটা পেরিয়ে গেল। এই প্রথম রাতের ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের মনেই বেশ ছাপ ফেলে গিয়েছিল। আমরা ভাবার চেষ্টা করেছিলাম, কলকাতায় আমরা আমাদের কোনও অতিথির জন্য এমন রাতবিরেতে কি এমনটা করতাম? মনে হয়েছিল, যে আন্তরিকতা ও সহজ সাবলীলতার সঙ্গে তাঁরা আমাদের আপন করে নিলেন, তা বুঝি বা তাঁদের সহজাত, তাঁদের সামাজিক জীবনযাপনের মধ্যে এভাবেই একে অন্যকে জড়িয়ে জাপটে বেঁচে থাকার রীতি বুঝিবা প্রচলিত।

এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতেই সাতটা-আটটার পর চলে আসতেন ধনীরাম টোটো—রাতে বারোটা-সাড়ে বারোটা অবধি চলত অনর্গল কথাবার্তা।

আমাদের থাকার জায়গার কাছেই ছিল সত্যজিৎ টোটোর বাড়ি। মাঠে চাষের কাজ সেরে সে মাঝ-দুপুর বা বিকেলে বাড়ি ফিরত। তারপর তার বাড়ির বারান্দায় একাধিকবার জমাটি আড্ডা হয়েছে—তার লেখা টোটো ভাষায় কবিতা পড়েছি, টোটো ভাষায় তার লেখা ও সুর দেওয়া গান শুনেছি। তার বয়সও চল্লিশের কাছাকাছি।

এছাড়াও দিনের বেলা পাহাড়-নদীখাত-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছু মানুষজনের সঙ্গে কথা হয়েছে।

একদিন টোটোপাড়া পেরিয়ে জিতি নদীর স্রোতের উল্টোমুখে ভুটানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভুটানে ঢুকে গিয়েছিলাম। ভুটানের মধ্যে জেংচু গ্রাম পেরিয়ে পাহাড়ের উপর জঙ্গলের গভীরে ডয়া উপজাতিদের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেইদিন ছিল মঙ্গলবার, টোটোপাড়ায় সাপ্তাহিক

হাট বসার দিন। প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টার সেই আসা-যাওয়ার পথে হাটমুখী বা হাটফেরতা বহু পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে দেখা—কখনো কিছু কিছু কথাও হল। তাঁদের মধ্যে টোটো, নেপালি, ভুটিয়া, ডয়া...এমন নানা উপজাতিরই মানুষ ছিলেন।

টোটো জনজাতি ও তাদের জীবনাচরণ-সংস্কৃতি নিয়ে কলকাতায় ছাপার অক্ষরে পড়া তথ্য-তত্ত্বগুলো রক্তমাংসের দেখা-শোনা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ লাগিয়ে দিচ্ছিল মগজে আর টোটোপাড়া এক অদ্ভুত আকর্ষণে বেঁধে ফেলছিল আমাদের। সেই বৃত্তান্তই এখন বলি।

## নিজেদের তৈরি জমি নিজেদের হাতছাড়া হওয়ার বৃত্তান্ত, বা, অবাক 'ভূমিসংস্কার'

জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসতভূমি ও কৃষিভূমির পত্তন করে টোটোপাড়ার জন্ম দিয়েছিল টোটো জনজাতির মানুষরাই। টোটো লোককথায় যেমন এর ইঙ্গিত মেলে, তেমনই নৃতাত্ত্বিক-গবেষকরাও এমনটাই মনে করেছেন। ১৯৫৫ সালে নৃতাত্ত্বিক চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছিলেন :

> পূর্ববর্তী বসতির ইতিহাস নির্দেশ করে যে তিন থেকে চার প্রজন্ম আগে ভালো সংখ্যক টোটো পশ্চিম ডুয়ার্স-এ বসবাস করত। তিস্তার পশ্চিমে বা সঙ্কোশ-এর পূর্বে টোটোদের বসতিস্থাপনের কোনও চিহ্ন নেই। তাই ধরা যেতে পারে যে তারা পশ্চিম ডুয়ার্সেই থাকত। গোটা পশ্চিম ডুয়ার্স তখন ভুটানের অধীন ছিল। ভুটিয়াদের হাতে পীড়ন, অন্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের কুখ্যাত ম্যালেরিয়ার কোপ—এই সমস্ত কারণে টোটোদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। কমতে কমতে শেষাবধি ডুয়ার্সের সমতল অঞ্চলের পুরানো বসতিগুলোয় টোটোদের আর চিহ্ন রইল না। প্রাণরক্ষা করতে পারা অল্প সংখ্যক টোটো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ভবঘুরে গোষ্ঠী হিসাবে আশ্রয় খুঁজতে থাকল। এমন প্রমাণ আছে যে তাদের মধ্যে একটা অংশ মেচ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, একটা অংশ নেপাল ও উত্তর ভুটানে গিয়ে সম্ভবত সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। আর অল্প কয়েকজন আশ্রয় নিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা এক পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর অংশে এবং সেই এলাকার চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল। এই স্থানটিই হল টোটোপাড়া, যেখানে ধীরে ধীরে তারা সংখ্যায় বাড়ছে। আজকের টোটোপাড়ায় এমন একজনও নেই যে সেই প্রাচীন বাসস্থানগুলোয় টোটোদের দুর্ভোগের গল্প শোনাতে পারে। (সূত্র ১, ইংরাজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা)

১৯৬৪ সালে সরকারি আধিকারিক ও সমাজ-গবেষক বি কে রায়বর্মন রচিত সরকারি প্রতিবেদনেও আমরা পাই :

> টোটো লোককথা অনুযায়ী, তারা কমপক্ষে সাত পুরুষ ধরে এই টোটোপাড়ার বাসিন্দা। আগে জায়গাটি ভুটানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীনে আসে।...১৮৮৯-৯৪ সালে সান্ডার্স দ্বারা পরিচালিত প্রথম জরিপ কর্মসূচিতে ৩.১২ বর্গমাইলের এই গোটা মৌজা টোটোদের সমগ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের 'মণ্ডল' বা 'প্রধান'-এর নামে নথিভুক্ত হয়েছিল। (সূত্র ২, ইংরাজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা)

টোটোপাড়ার পূজা গাঁও-এ একটা পুরানো প্রথার টোটোঘর। ঘরের সামনে টোটো বালিকা আর সামনের উঠোনে পোষ্য পশু। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

টোটোদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে চোদ্দটি টোটো পরিবার এই অঞ্চলে এসে প্রথম জঙ্গলের মধ্যে বসত-কৃষি-পশুপালন-এর সূচনা করেন –তাদের উত্তরপুরুষই আজকের টোটোরা। সেই চোদ্দোটি পরিবারের এক একটির উত্তরপুরুষেরা এক একটি গোষ্ঠী—এইভাবে টোটোসমাজ আজও চোদ্দটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেই বসত পত্তনের সময় থেকেই টোটোপাড়ার সমস্ত জমি টোটোদের গোষ্ঠীগত মালিকানাভুক্ত হিসাবে তারা ভেবে এসেছে—জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তাদের ছিল না। বসত, কৃষি ও পশুপালনের জন্য কোন্ জমি কে ব্যবহার করবে তা তারা তাদের গ্রামীণ পরিষদের মাধ্যমেই ঠিক করত।

১৯৬৯ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের আধিকারিক ও জমি জরিপকারীরা টোটোপাড়ায় 'ভূমিসংস্কার' করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে হাজির হলেন। সেই সময়কার সরকারি প্রতিনিধি স্থানীয় আধিকারিক অমল কুমার দাসের মুখ থেকেই শোনা যাক সরকারি ভাবনাচিন্তা কী ছিল। ১৯৬৯ সালে অমল কুমার দাস লিখেছিলেন :

'সিডিউলড কাস্টম অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট'-এর আঞ্চলিক দফতরের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে টোটো পরিবারদের মধ্যে ১১.৩৬% ১ একরের কম জমির মালিক, ৪৮.৮৭%-এর ১-২ একর জমির, ১২.৫০% ২-৩ একর জমির। ১৫.৯১% ৩ একরের উপর জমির এবং বাকি ১১.৩৬%-এর কোনও জমি নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৮৯-৯৪ সালে সান্ডার্সের করা প্রথম জমি-বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় টোটোদের গোটা মৌজা নথিভুক্ত করা হয়েছিল টোটোদের সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে টোটো মণ্ডল বা প্রধান-এর নামে এবং এই জমিব্যবস্থাই এখনও অবধি চালু আছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জমি নথিভুক্ত করা হবে আলাদা আলাদা ব্যক্তি টোটোর নামে, যে পরিমাণ জমি এখন তার অধিকারে আছে তার ভিত্তিতে। এটা করার উদ্দেশ্য তাদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যদের দ্বারা তাদের জমি দখল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। এটাও জানা গেছে যে ব্যক্তি টোটোদের নামে জমির মালিকানার নথিভুক্তিকরণ প্রাথমিকভাবে হওয়ার পর সরকার ভূমিহীন টোটোদের জমি দিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং একজনের অধিকারে কী পরিমাণ জমি রাখা বাস্তবসম্মত ও সমীচীন তা নির্ধারণ করবে যাতে টোটোদের মধ্যে ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এবং ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে অভাবিত কোনও জটিলতা এড়ানো যায়।...সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারগণের কাছ থেকে এও জানা গেছে যে ব্যক্তি টোটোদের নামে জমি নথিভুক্তকরণ হওয়ার পর, প্রত্যেকের অধিকারস্থ জমি-সম্পত্তির ভিত্তিতে একটি সরকারকে প্রদেয় খাজনা স্থির করা হবে, যা তাদের অধিকারস্থ জমির কম উর্বরতাকে বিচারে রেখে খুব একটা বেশি হবে না। এই ব্যবস্থা আপনা হতেই তাদের ভূ-সম্পত্তির নিশ্চয়তাকে জোরদার করবে। (সূত্র ৩, পৃ. ৬৪-৬৫, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

উপরের ভাবনা, যা ১৯৬৯ সালের সরকারি 'ভূমিসংস্কারক'-দের পরিচালিত করেছিল, তার মধ্যে অদ্ভুত কিছু স্ববিরোধিতা, বিভ্রম চোখে পড়ে, যেমন :

১. বক্তব্যের শুরুতে টোটো পরিবারদের 'মালিকানা'-য় থাকা জমির যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তা কী ধরনের জমির? বসতজমি, কৃষিজমি ও পশুচারণক্ষেত্র—ব্যবহারের নিরিখে টোটোপাড়ার জমিকে এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। ওই জমির হিসাব কি এই তিন ধরনের জমি মিলিয়ে মোট জমির? তা হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ, টোটোপাড়ার ইতিহাসে গৃহহীন (রাস্তায় দিন কাটানো) কোনও পরিবার বা প্রজা হিসাবে কোনও পরিবার ছিল না। বসতজমি সব পরিবারেরই কিছু না কিছু ছিল—ফলে মোট জমির হিসাব ধরলে কোনও পরিবারই ভূমিহীন হতে পারে না। তাহলে হিসাব কি কৃষিজমি ও পশুচারণভূমির?

২. হিসাবটা যদি কৃষিজমি ও পশুচারণভূমির বলেই ধরে নিই, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে জমির উপর পরিবারগুলোর মালিকানা বলতে কোন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে? লেখাটিতে যেভাবে জমির মালিক হওয়ার কথা (মূল ইংরাজিতে 'possess' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে) বলা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তীতে যেভাবে ভূ-সম্পত্তির ভারসাম্য আনার কথা বলা হয়েছে, শোষণ থেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা মিলিয়ে পড়লে মনে হয় বুঝি বা টোটো পরিবারগুলির প্রধান ব্যক্তিদের জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা কায়েম ছিল, যাকেই নথিভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে গোচরে এনে সংস্কার করতে চাইছে সরকার। এর চেয়ে হাস্যকর বিভ্রম আর কী হতে পারে! কারণ, টোটোদের সমস্ত জমি যে তাদের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে গোষ্ঠীপতি বা মণ্ডলের নামে নথিবদ্ধ হয়েছিল, যার উল্লেখ অমল কুমার দাসও করেছেন, তা তো জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি ও গোষ্ঠীগত মালিকানার উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। ফলে, ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি এবং সেই সম্পদ ব্যবহার করে হওয়া উৎপাদনের ফলের উপর ব্যক্তিগত আত্মীকরণের প্রথা চালু আছে এমন সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে টোটো সমাজের বিচার করা বিভ্রম উৎপাদন ছাড়া আর কী বা হতে পারে? সরকারি দফতরের সংগৃহীত তথ্য কি তাহলে প্রকৃতই টোটো সমাজ সম্পর্কে কোনও ধারণা দিচ্ছে, না কি তা টোটো সমাজের মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞানতাকেই পুষ্ট করছে? ভূ-সম্পত্তির উপর

গোষ্ঠীমালিকানাভুক্ত একটি সমাজে যেখানে ভূ-সম্পত্তি ভিত্তিক উৎপাদনের কাজ ও তার উৎপাদনের বণ্টন গ্রামীণ পরিষদের যৌথ তত্ত্বাবধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে শোষণ, ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদির রূপটা কী তা আদৌ স্পষ্ট হল না, অথচ তা দূর করার ব্যবস্থাপত্র সরকার রচনা করে ফেললেন!

৩. এই ব্যবস্থাপত্রের অন্যতম বিধান হল মালিকানাভুক্ত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে সরকারকে প্রদেয় খাজনা নির্ধারণ, যা নাকি টোটোদের 'ভূ-সম্পত্তির নিশ্চয়তাকে জোরদার করবে'। এই খাজনা তো দিতে হবে অর্থে, ফলত প্রতিটি পরিবারের অর্থকরী রোজগার থাকতে হবে, নাহলে সে এ খাজনা দেবে কীভাবে? যে টোটোরা মূলত কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যই উৎপাদন করেন, তাঁরা খাজনা দেবেন কীভাবে? অর্থ মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার ভারই কি তাকে জমি-মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে না—'নিশ্চয়তাকে জোরদার' করার নাম করে কি অনিশ্চয়তারই আমদানি করা হবে না?

এই বিভ্রমপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে 'অগ্রগতি-উন্নতির একমাত্র পথ' বলে জয়ঢাক পিটিয়ে সরকারি 'ভূমিসংস্কারক' আধিকারিকরা কী করলেন আর তার ফল কী দাঁড়াল? নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মুজমদারের ১৯৯৬ সালের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি :

> ১৯৬৯ সালের আগে পর্যন্ত টোটোপাড়ার ১৯৯১.৫৯ একর জমি টোটো দলপতি ধনপতি টোটোর নামে টোটোদের যৌথ সম্পত্তি হিসাবে নথিভুক্ত ছিল। ১৯৬৯ সালে কোনও কারণ না দেখিয়ে ৩৪৭.৪৩ একর বাদে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন (৩৮)-এর ৪৪(২ক) ধারামতে টোটোদের সব জমি জেলাশাসকের খাস জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে। অন্যদিকে ৩৪৭.৪৩ একর জমি (যা সেবছর টোটোদের চাষের এলাকা ছিল) ৮৯টি টোটো পরিবারের ব্যক্তিগত জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে। এর ফলে বর্তমানে (১৯৯১-এ) ৯১টি পরিবারের নথিভুক্ত কোনও জমি নেই। নিজেদের জমিতেই তাঁরা ভূমিহীন। আবার যেসব পরিবারের জমি আছে, তাদের মধ্যে ৬০টি পরিবারের জমির পরিমাণ ৪ একরেরও কম। অথচ কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে টোটোপাড়ার মতো জায়গায় ৫ একরের কম জমি অর্থনৈতিক দিক থেকে চাষের পক্ষে লাভজনক নয়। অন্যদিকে বহিরাগতরা টোটোপাড়ার সবচেয়ে ভালো জমিগুলি দখল করে নিয়েছে এবং তাঁদের জমির পরিমাণ ৫-১৫ একরের বেশি। এভাবে আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে টোটোরা সারাক্ষণ জীবিকার তাড়নায় ব্যস্ত থাকেন...। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬১)

ভাষাতাত্ত্বিক সুধীর কুমার বিষ্ণু-র ২০১২ সালের লেখা থেকেও আমরা পাই :

> ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১৯৯১.৫৯ একর জমি তাদের (টোটোদের) প্রধানের নামে সংরক্ষিত রেখেছিল যাতে তা বহিরাগতদের দ্বারা দখল না হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬৯-এর ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী টোটোদের চাষজমির সিংহভাগ 'ভেস্ট' বলে ঘোষণা করা হয় এবং বহিরাগতরা তা দখল করে নেয়। সেই সময় থেকে টোটোরা তাদের নিজেদের জমিতেই শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে চরম দারিদ্র্যে। (সূত্র ৫, পৃ. ২৮, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

সরকারের 'অবাক ভূমিসংস্কার'-এর মাধ্যমে নিজভূমে শরণার্থী হওয়ার জন্য ক্ষোভ টোটোদের সঙেগ এ বিষয়ে কোন আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেই টের পাওয়া যায়। ধনীরাম টোটো এখনও এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করে যান কীভাবে সেইদিন তাঁরা সরকারের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন—তাঁর কথা শুনে সেই সময়ে কী ঘটেছিল তা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও আধিকারিকেরা ১৯৬৯ সালে এসে টোটোদের বলেছিলেন যে সমস্ত জমি গোষ্ঠীগত মালিকানাধীনে টোটোদের প্রতিনিধি হিসাবে গোষ্ঠীপতি বা প্রধান-এর নামে নথিভুক্ত করা যাবে না। তা করলে সে জমি প্রধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ধরা হবে। ফলে প্রধান বিবেচিত হবে 'বড়ো জমিদার' হিসাবে এবং ভূমিসংস্কার আইন বলে 'সিলিং বহির্ভূত' সমস্ত জমি সরকার খাসজমি হিসাবে বাজেয়াপ্ত করে নেবে। সরকারি প্রতিনিধিরা বলে যে জমি প্রতি পরিবার পিছু একজনের নামে ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত হিসাবেই নথিভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি আর একটা ব্যাপারও ছিল। ১৯৬৯-এর আগে অবধি পরিবার পিছু গড়ে বাৎসরিক ২ টাকা ধরে একটা মোট খাজনা একলপ্তে মণ্ডল বা প্রধানের কাছ থেকে সরকার আদায় করত। ১৯৬৯-এ সরকারি প্রতিনিধিরা বলল যে প্রতিটি টোটো পরিবারের প্রধানকে আলাদাভাবে অর্থ খাজনা দিতে হবে তার পরিবারের মালিকানাভুক্ত জমির মাপ অনুযায়ী। সে খাজনা দিতে না পারলে সরকার তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেবে। টোটোরা চকিত বিহ্বল হয়ে পড়ল। জমির উপর ব্যক্তি মালিকানার

কোনও ধারণা তাদের সংস্কৃতিতে না থাকায় তাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কীভাবে তারা পশুচারণভূমি, কৃষিভূমিকে পরিবার পিছু ভাগ করবে— সাধারণভাবে কোনও পরিবারের নির্দিষ্ট একখণ্ড কৃষিজমি বা নির্দিষ্ট একখণ্ড পশুচারণভূমি তাদের রীতিতে ছিল না। তার উপর বেশির ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রেই টাকায় রোজগার ছিলই না বা যৎকিঞ্চিৎ ছিল—ফলে অর্থ খাজনা নিয়মিতভাবে সরকারকে দেওয়া তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ওদিকে, খাজনা না দিলে সরকার শাস্তি দেবে, জমিও কেড়ে নেবে—এই আশঙ্কা বড়ো হয়ে উঠল। তাই বহু পরিবার ভয়েই জমি নথিভুক্ত করাল না। আর যারা জমি নথিভুক্ত করালও বা, তারাও খাজনার ভয়ে অল্পস্বল্প

টোটোপাড়ায় হাটের দিনে কেউ হাট অভিমুখে, কেউ বা হাট থেকে ফিরছে। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

জমি করাল। ফল দাঁড়াল এই যে ১২৩টি পরিবারের মধ্যে ৮৯টি পরিবার মাত্র ৩৪৭.৪৩ একর জমি নথিভুক্ত করাল, ৩৪টি পরিবার হয়ে দাঁড়াল 'ভূমিহীন' আর ১৯৯১.৫৯ একর জমির বাকিটা খাসজমি হিসাবে সরকারের দখলে চলে গেল। সরকার সেই জমি দখলে নিয়ে যখন দখলদারি পাট্টা দিতে শুরু করল, তখন দেখা গেল যে 'ভূমিহীন টোটোদের' জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা হল না। ব্যক্তি মালিকানা ও অর্থকরী লেনদেনে অভ্যস্ত নেপালিরা বাইরে থেকে এসে সরকারি 'খাস' জমির দখলদারি পাট্টা দখলে নিতে লাগল। টোটোপাড়ার মোট জমির ৮০ শতাংশের উপর থেকে এভাবে টোটোদের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল, টোটোপাড়ায় নেপালিদের সংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি টোটোদের ছাপিয়ে গেল। এই সুযোগে টোটোদের নিজেদের গ্রামীণ পরিষদের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনার ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করে দেশের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হল। পঞ্চায়েতেও সদস্যসংখ্যায় টোটোরা হয়ে দাঁড়াল সংখ্যালঘু নেপালিদের তুলনায়।

টোটোপাড়ায় টোটোদের পাড়া সংকুচিত হয়ে গেল। ধনীরাম টোটো বলছিলেন যে এই নিয়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ ও ন্যায্য প্রতিবিধানের দাবি এই ২০১১ সালে রাজ্যে বিধানসভায় পরিবর্তনের পরের নতুন সরকারের কাছে এসে জানিয়ে গেছেন আবারও। টোটোদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি কীভাবে সরকার-বাহিত 'আধুনিকতা' ও 'উন্নয়ন'-এর অভিঘাতে দ্বন্দ্ব-সমস্যায় অস্থির হয়ে উঠছে তা আরও কিছুটা বিশদে বোঝার জন্য টোটোপাড়ায় টোটোদের পাড়াগুলোর দিকে এবার নজর ফেরানো যাক।

### টোটোদের গ্রাম, টোটো জনসংখ্যা

টোটোপাড়ার যে গ্রামগুলোতে মূলত টোটোরা বাস করে, সেগুলো হল :

১. পঞ্চায়েত গাঁও (১২০টি পরিবার)।
২. সুব্বা গাঁও বা কাইজি গাঁও (৬৮টি পরিবার)।
৩. মণ্ডল গাঁও বা গাপ্পু গাঁও (৩৫টি পরিবার)।
৪. মিত্রং গাঁও (৩৪টি পরিবার)।
৫. দুমসি গাঁও বা বৌদুবে গাঁও (৩২টি পরিবার)।
৬. পুজা গাঁও বা বুদুবে গাঁও (২৩টি পরিবার)।
৭. পাখা গাঁও (২০টি পরিবার)।

(বন্ধনীর মধ্যে পরিবারের সংখ্যাগুলো যে টোটোদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তাঁদের বলা আন্দাজ থেকে দেওয়া হয়েছে।)

এছাড়া টোটোপাড়ার মধ্যে মঙ্গর গাঁও, পোয়ারগাঁও, কাবরাবতি-র মতো গ্রাম আছে, যেখানে মূলত নেপালিদের বাস।

বর্তমানে (২০১৫-র জুনে) টোটোপাড়ায় টোটোদের সংখ্যা ১৫০০-র অল্প কিছু বেশি, আর নেপালিদের সংখ্যা ১৮০০-র কিছু বেশি (এই সংখ্যা ধনীরাম টোটোর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী)।

১৯৯১ সালে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদারের করা ক্ষেত্রসমীক্ষা আমাদের বলে যে সেই সময়ে টোটোপাড়ায় টোটোদের সংখ্যা ছিল ৯২৬ (টোটোপাড়ার মোট জনসংখ্যার ৪১.৩%), নেপালিদের সংখ্যা ছিল ১১৬৬ (মোটের ৫১.৯%) আর বাকি ৬.৮% মধ্যে বিহারী (৮৩ জন, ৩.৭%) ও হাতে গোনা কয়েকজন রাজবংশী, গারো, লেপচা ও মেচ। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬০)

টোটোদের সংখ্যা একসময় খুব কমে গেলেও, ওঠাপড়ার

মধ্য দিয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ার দিকেই। এই ওঠাপড়ার ছবিকে সময়-সারণি হিসাবে দেখলে, তা এইরকম :

| বছর | পরিবারের সংখ্যা | জনসংখ্যা | | | ১০ বছরে পরিবর্তন (+বৃদ্ধি, – হ্রাস) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১৯০১ | ৩৬ | ৭২ | ৯১ | ১৭১ | → + ৮৮ |
| ১৯১১ | ৬০ | ১২৫ | ১১০ | ২৩৫ | → + ৩৬ |
| ১৯২১ | ৬০ | ১৪০ | ১৩১ | ২৭১ | → + ৬৩ |
| ১৯৩১ | ৬৩ | ১৩০ | ২০৪ | ৩৩৪ | → – ১৩ |
| ১৯৪১ | — | ১৫৯ | ১৬২ | ৩২১ | → – ০ |
| ১৯৫১ | ৬৯ | ১৬১ | ১৬০ | ৩২১ | → + ৭৪ |
| ১৯৬২ | ৮৫ | ২০৬ | ১৮৯ | ৩৯৫ | → + ২৫৫ |
| ১৯৭১ | ৯৬ | ৩৩২ | ৩১৮ | ৬৫০ | → + ৫৬ |
| ১৯৮১ | ১৩৫ | ৩৫৭ | ৩৪৯ | ৭০৬ | → + ২২০ |
| ১৯৯১ | ১৪১ | ৪৭১ | ৪৫৭ | ৯২৬ | → + ২৪৯ |
| ২০০১ | ২৩৮ | ৬১০ | ৫৬৫ | ১১৭৫ | → + ২১৪ |
| ২০১১ | ৩০৬ | ৭৩৯ | ৬৫০ | ১৩৮৯ | |

(তথ্যসূত্র : বিভিন্ন সরকারি জনগণনার ফল থেকে একত্রিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে টোটোদের সংখ্যা আলাদাভাবে না গুণে ভুটিয়াদের সঙ্গে মিলিয়ে গোনা হয়েছিল, ফলে ১৯৬১ সালের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাই ১৯৬১ সালের বদলে ১৯৬২ সালের তথ্য নেওয়া হয়েছে।)

এই সারণি দেখাচ্ছে যে ১৯০১ থেকে ১৯৩১ পর্যায়ে টোটোদের সংখ্যা বর্ধমান থাকলেও ১৯৩১ সালের পর থেকে দুই শতক তা কমেছে, বাড়েনি। এই দুই দশকের মধ্যে গোটা ডুয়ার্স এলাকাতেই দেখা দিয়েছিল ভয়াল দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পার্শ্বফল হিসাবে। এছাড়া টোটোপাড়ায় আর কোনও বিশেষ কারণ কি কাজ করেছিল? ১৯৬০-এর দশকে জনসংখ্যা আবার সংকোচন বা স্থবিরভাব কাটিয়ে উঠে বৃদ্ধির পথে দ্রুতগতি হয়। কিন্তু আবার তা থমকে দাঁড়ায় ১৯৭১-এর পর এক দশক। কেন? ১৯৬৯-এ ভারত সরকারের ভূমিসংস্কারের নামে টোটোদের নিজভূমে শরণার্থীতে পরিণত করার প্রভাবই কি এর কারণ? যেভাবে সরকার তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনাচরণে মুষলাঘাত করে টোটোদের নিক্ষিপ্ত করল 'আধুনিক দারিদ্র্যে', তাই কি তাদের জীবনরস শুষে নিয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি স্তিমিত করে দিয়েছিল? ১৯৮১ সালের পর তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আবার তেজি হয়ে উঠেছে—প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝে এই জীবনশক্তি টোটোরা আবার কীভাবে সংহত করল? এই প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখেই এবার টোটোদের জীবনাচরণের ঐতিহাসিক প্রবাহের দিকে নজর ফেরানো যাক।

## টোটোদের জীবন-জীবিকার অর্থনৈতিক বিবর্তন

১৮৬৪-৬৫ সালের ডুয়ার্স যুদ্ধের মধ্য দিয়ে টোটোদের সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশদের আধিপত্যাধীনে আসে। তার আগে অবধি এই অঞ্চল ছিল ভুটানের অধীন। ভুটানের দুর্গাধিপতি সামন্তপ্রভুরা প্রায়শই সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে 'খাজনা' লুঠ করে নিয়ে যেত এই অঞ্চল থেকে। তাছাড়া, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছিল তাদের বাণিজ্য পথ। টোটো, শেরপা, ডয়া, জলদা—এইসব উপজাতির মানুষরা ছিল সেইসব ভুটিয়া প্রভুদের বেগার-খাটিয়ে বা দাস-খাটিয়ে, যারা ছিল বিনা পারিশ্রমিকে পণ্য বহন করতে বাধ্য। ভুটিয়াদের জংখা ভাষায় এদের বলা হত 'জাপো', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'দাসপ্রজা'। এই ভারবহন ব্যবস্থাকে জংখা ভাষায় বলা হত 'হুইওয়া', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'বেগার শ্রমদান'। টোটোদের বসতিগুলো দুর্গম অরণ্য এলাকায় ভুটিয়াদের বাণিজ্যিক পথের উপর স্থাপিত হত। টোটো-রা ব্যাবসায়িক পণ্যগুলো ভুটান পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের বাজার-হাটে বা ডুয়ার্সের বাজার-হাট থেকে ভুটানের পাহাড়ে পৌঁছে দিত। ভুটান পাহাড় থেকে ভুটানের আরও ভিতরে আনা-নেওয়ার কাজে পণ্য বহন করত ডয়া ও ডুকপা জাতির বেগার-খাটিয়েরা। এইভাবে 'হুইওয়া'-র অঞ্চলভাগ ছিল। এই বেগার খাটার পাশাপাশি টোটোরা তাদের গোষ্ঠীগত মালিকানাধীন কৃষিজমিতে ঝুমচাষের মাধ্যমে 'কাউন' বা 'সামা' খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। বন থেকে সংগ্রহের মাধ্যমেও খাদ্য সংগ্রহ করত। আর ছিল 'আংদাইওয়া', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'ছোট বাণিজ্যিক পরিক্রমা'। টোটোপাড়ায় প্রচুর কমলালেবুর গাছ ছিল। সেই গাছের কমলালেবু বাজারে বহন করে নিয়ে এসে টোটোরা কিছু উপার্জন করত বা বিনিময় প্রথায় কিছু ব্যবহার্য বস্তু সংগ্রহ করত। এরই নাম ছিল আংদাইওয়া।

১৮৬৬ সালের পর থেকে ডুয়ার্স ব্রিটিশ আধিপত্যে আসার পর টোটোরা বেগার খাটার প্রথা থেকে মুক্তি পায়, 'হুইওয়া' প্রথার অবসান ঘটে। এরপর থেকে তারা নিজেদের গোষ্ঠীমালিকানাভুক্ত জমিতে ব্যাপক হারে কমলালেবুর চাষ বাড়াতে থাকে। সেই কমলালেবু বিক্রি করে অর্থ ও অন্য নানা পণ্য সংগ্রহের অভ্যাস গড়ে ওঠে। একে তারা বলত 'পীচ্‌কো হওয়ার', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'দীর্ঘ

বাণিজ্যিক পরিক্রমা'। জমির উপর গোষ্ঠীগত মালিকানাভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে পণ্য-বিনিময়-ভিত্তিক উপার্জনের এক সংমিশ্রণ তাদের বস্তুগত জীবনে অভূতপূর্ব উন্নতির সূচনা ঘটায়। কিন্তু তা হঠাৎই একধাক্কায় চুরমার হয়ে যায় ১৯৩১ সালে।

১৯৩১ সালে অজানা রোগের মড়কে কমলালেবুর চাষ টোটোপাড়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেন মরে গেল কমলালেবুর গাছগুলো? টোটোদের মধ্যে লোকমুখে এমন একটা কথা প্রচলিত আছে যে মেচ জনজাতির মানুষেরা বৈরি মনোভাব থেকে অভিশাপ দেওয়ায়, তার প্রভাবে কমলালেবু গাছগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধনীরাম টোটো অবশ্য তাঁর নিজের অনুমান হিসাবে অন্য একটি কারণের কথা বলেছেন। ধনীরাম টোটো বলেছেন যে বনজঙ্গল কেটে কমলালেবু গাছ লাগনোর অতিরিক্ত প্রবণতা ধীরে ধীরে আলগা করে দিয়েছিল উপরের উর্বর মাটি-স্তরকে, বর্ষার জলে ধুয়ে তা নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, পড়ে থাকা অনুর্বর মাটি স্তর অযোগ্য ছিল কমলালেবু চাষের জন্য।

এই ধাক্কা টোটোদের জীবন-জীবিকাকে ওলট-পালট করে দেয়। উপার্জনের যে পথ তাঁদের জীবনকে বস্তুগতভাবে উন্নত করে তুলছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সাধারণ পরিস্থিতি সেই সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। বহু টোটো তাঁদের পরিচিত ভারবহনের কাজে আবার ফিরে যান—তবে এবার আর বেগারে নয়, মজুরির বিনিময়ে। ভুটানের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কমলালেবু বহন করে এনে শীতের কয়েকমাস তাঁরা বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। টোটোপাড়ায় গড়ে উঠেছিল ভুটানের কমলালেবু রপ্তানির আড়ত। এছাড়াও, ভুটানের বিভিন্ন জায়গায় দৈহিক শ্রমের কাজে অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য বহুজন যেতে থাকেন। কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে টোটো পরিবারেরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, তাও গোটা বছর চলার মতো নয়, ফলাতে পারত। ১৯৩১-১৯৫১ সময়কালে টোটোদের জনসংখ্যা কমে যাওয়া বা না বাড়া এই সংকটকালীন পর্যায়কেই চিহ্নিত করে।

ভুটানের কমলালেবু রপ্তানি ও ভুটানে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে খাটতে যাওয়া—এই দুটো টোটোসমাজে এখনও জীবিকা হিসাবে আছে, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। ১৯৮৯ সালে ভুটানে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভুটান সরকার টোটোপাড়ার সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ফলে ওই পথে কমলালেবুর বড়োমাপের চালান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যভাবে কিছু টোটো এখনও ভুটানের কমলালেবু রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, যা আমরা জানতে পারলাম সত্যজিৎ টোটোর সঙ্গো আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে। সত্যজিৎ টোটোর জীবিকা মূলত কৃষিকাজ আর ভুটানে শ্রমিক হিসাবে খাটতে যাওয়া। কিন্তু টাকা জমিয়ে উঠতে পারলে সে ভুটানের কমলালেবু চাষের অঞ্চলে চাষশুরুর সময় চলে গিয়ে কমলালেবুর বাগান ভাড়া নেয়। চাষের গোটা সময় সেখানে থেকে, ফল উঠলে তা বেচে, উপার্জিত অর্থ নিয়ে সে ঘরে ফেরে। ১৯৮৯-এর পর থেকে ভুটানে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে গেলেও টোটোদের ভুটানে 'ওয়ার্ক পারমিট' করাতে হয়। সত্যজিৎ টোটোর কাছেই শুনছিলাম তাঁর ঠিকা শ্রমিক হিসাবে ভুটানে কাজ করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা করা বা রাস্তা সারাই, পাহাড়ি নদীর উপর সেতু তৈরি বা সেতু সারাই—এমন নানা ধরনের নির্মাণের কাজে অন্য টোটোদের মতো সত্যজিতও যান। তিনি বলছিলেন যে কাজ চলাকালীন খাওয়া-দাওয়া ও মদ অঢেল দেয়, কিন্তু মজুরি বেশ কম। তাও আবার অনেক সময় কাজ করার পরও টোটোদের মজুরি মারা যায়, মজুরি না দিয়েই তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়, ভুটানে তাদের কিছু করার থাকে না। সেইজন্য অনেক টোটোই 'ওয়ার্ক পারমিট' করার সময় নিজেদের আসল নামে না করিয়ে কোনও একটা ভুটানি নামে করায়। সত্যজিতের নিজের 'ওয়ার্ক পারমিট'-এর কার্ডটাও দেখলাম— ছোটো নীল আয়তাকার কার্ড, প্লাস্টিকে মোড়া, তার উপর সত্যজিতের ছবি, কিন্তু নামের জায়গায় একটা ভুটানি নাম। এছাড়া আছে এই মজুরির কাজ করতে যাওয়ার আর একটা বিপদ—জীবন হারানোর ভয়। পাহাড়ের গায়ে রাস্তা বা সেতু তৈরির কাজ করানো হয় ঝুঁকিপূর্ণভাবে, শ্রমিকদের সুরক্ষার কোনও বন্দোবস্ত না করেই। বহু টোটো ভুটানে খাটতে গিয়ে খাদে পড়ে মারা গেছে। শ্রমিকদের জীবনের দাম অত্যন্ত কম—দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণের কোনও বালাই নেই।

সেই ১৯৩১ সালের পর থেকেই ভুটানের কমাললেবু রপ্তানি বা ভুটানে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যাওয়ার পাশাপাশি আর একটা দিকেও টোটোরা নজর দিয়েছিল, তা হল টোটোপাড়ায় কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য কৃষিকাজ।

বি কে রায় বর্মনের ১৯৬৪ সালের লেখা থেকে আমরা পাই :

> কমলালেবু উৎপাদন ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প জীবিকার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। একই সঙ্গে, জমি-বুভুক্ষু নেপালি মানুষেরা চাপ তৈরি করছিল কমলা বাগান মরে যাওয়ার পর আনাবাদি হিসাবে পড়ে থাকা জমিগুলো ব্যবহারের জন্য। টোটোরা যেহেতু লাঙলের দ্বারা স্থিতু চাষে অভ্যস্ত ছিল না, তাদের কিছু নেতা টোটোপাড়ায় নেপালিদের বসতিস্থাপনকে স্বাগতই জানিয়েছিল। তাদের উৎসাহপ্রদানে অল্প কিছু নেপালি পরিবার প্রথমে টেটোটাপাড়ায় বসত-স্থাপন করে প্রায় ৩০ বছর আগে। তারপর নেপালিদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, এখন প্রায় ৩০০ জন নেপালি বসবাসকারী আছে টোটোপাড়ায়। (সূত্র ২, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

এর প্রায় ৩০ বছর পর, ১৯৬৯ সলে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদরের পর্যবেক্ষণ হল :

> কমলাবাগান নষ্ট হওয়ার পর টোটোরা তাঁদের জীবিকার জন্য কৃষির ওপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়। কিন্তু ভারবাহীর কাজ ও পরে কমলালেবুর চাষের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকায় টোটোরা সাধারণ কৃষিকাজেও (এমনকি ঝুমপদ্ধতিতেও) প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। কয়েক দশক আগেও তাঁরা প্রধানত ঝুমচাষ করতেন, লাঙলের ব্যবহার জানতেন না। পরে তাঁরা লাঙলের ব্যবহার শিখেছেন। ১৯৭৫ সালের পর প্রধানত সরকারি কৃষিবিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে তাঁরা বর্তমানে ধানচাষের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। কিন্তু এখনও টোটোদের অদক্ষ কৃষকই বলা যেতে পারে। তার বেশি নয়। উন্নত সার, বীজ ও সেচের ব্যবহারে এখনও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তার জন্য প্রয়োজনীয় জমিও এখন আর সকলের নেই। (সূত্র ৪, পৃ. ১৫৯)

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৯-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যশস্য চাষ টোটোপাড়ার অর্থনীতিতে বড়ো জায়গা করে নিয়ে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও, সেই ক্ষেত্রে টোটোদের তুলনায় নেপালিদের আধিপত্য ক্রম-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুইটি কারণে— প্রথমত, প্রথাগতভাবে টোটোরা কৃষিকাজে অদক্ষ হওয়ায় ও দ্বিতীয়ত, ১৯৬৯ সালের সরকারি 'অবাক ভূমিসংস্কার'-এর ফলে টোটোদের হাত থেকে কৃষিজমি ও পশুচারণক্ষেত্রের সিংহভাগ নেপালিদের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ায়। তাই, এখনও অবধি টোটোদের কৃষিকাজ মূলত নিজেদের খোরাকি উৎপাদনের স্তরেই আছে। বাজারের জন্য কৃষি উৎপাদন ও সেই সূত্রে রোজগার নেপালিদের হাতে কেন্দ্রীভূত। প্রধানত যে ফসলগুলো টোটোরা চাষ করে, এবং সে চাষের সময় ও পদ্ধতি হল :

| ফসল | চাষের সময় | চাষের পদ্ধতি |
|---|---|---|
| ভুট্টা | জুলাই-সেপ্টেম্বর | স্থিতু চাষ |
| কাওনি | আগস্ট-অক্টোবর | যাযাবরি চাষ |
| টোটো মারুয়া (প্রথাগতভাবে চাষ হওয়া মারুয়া) | মার্চ-এপ্রিল | যাযাবরি চাষ |
| নেপালি মারুয়া (নেপালিদের চালু করা মারুয়া চাষ) | ডিসেম্বর-জানুয়ারি | স্থিতু চাষ |

ধান মূলত নেপালিরা চাষ করে, টোটোদের মধ্যে ধান চাষ খুবই কম। এক একটি টোটো পরিবার তাদের নিজেদের চাষের ফসল দিয়ে গড়ে ছয়-সাত মাসের খোরাকি তুলে নিতে পারে, বছরের বাকি সময়ের খোরাকির জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় কৃষি ছাড়া অন্যান্য সূত্রে উপার্জন করে সেই টাকায় বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারার উপর।

টোটোপাড়ায় দোকানপাট চালানো, খুচরো ব্যাবসা করা—এসব করেন মূলত বিহারিরা, আর কিছু নেপালিরা। টোটোদের এ জীবিকায় দেখা যায় না বললেই চলে। প্রতি মঙ্গলবার টোটোপাড়ার সুব্বাগাঁও-এর বাজার এলাকায় হাট বসে। শুধু টোটোপাড়া নয়, আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে, এমনকি কাছাকাছি ভুটানের গ্রাম থেকে, ভুটানের ডয়া উপজাতিদের গ্রাম থেকেও, বহু মানুষ পাহাড়ি পথে হেঁটে এই হাটে এসে জড়ো হয়। এই হাটের বিক্রেতারা বেশিরভাগই মাদারিহাট থেকে এসে একদিনের জন্য এখানে দোকান বসায়। 'ইউ' (মাড়ুয়া বা কাওনি থেকে তৈরি পানীয়)-এর কিছু 'ঠেক' টোটোরা এই হাটে বসায়—কিন্তু তা ছাড়া এখানে আর কোনও টোটো ব্যাপারি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে বছর কুড়ি সময়কাল বাঁশ একটি অর্থকরী ফসল হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

টোটোপাড়ায় তখন প্রচুর বাঁশঝাড় ছিল। বাঁশ টোটোদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে রান্নার পাত্র বা পানপাত্রও টোটোরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করত। সরকারি আধিকারিকরা টোটোদের উৎসাহিত করে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোয় বাঁশ বিক্রি করার জন্য। সরকারি দফতর টোটোদের একটা সমবায় সংস্থাও গড়ে দেয় এই ব্যাবসার কাজ পরিচালনার জন্য। বছর কুড়ি সময়কাল প্রচুর বাঁশ বিক্রি হয়, টোটোরা বেশ কিছু উপার্জনও করেন। তারপর কমলালেবু গাছের মতোই, বাঁশের ঝাড়ও টোটোপাড়ার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। এখন বাঁশের ঝাড় প্রায় দেখাই যায় না। ফলে, বাঁশ বিক্রি তো বন্ধ হয়েছেই, নিজেদের নিত্য-ব্যবহারের জন্যও এখন টোটোদের বাঁশ মেলে না।

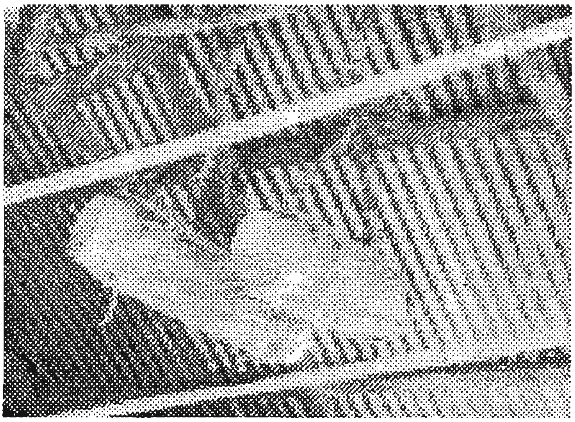

টোটোদের উপাসনাস্থল দেমসার চালে টাঙান দুটো ঢোলক। টোটোরা প্রকৃতির উপাসক। এই ঢোলদুটোই তাদের দেবতা— এদের একটার নাম চিগাইসু, অন্যটির নাম মুগাইসু—একটি পুরুষ, অন্যটি নারী। উপাসনাস্থলে অন্য কোনও মূর্তি বা দেবাবয়ব নেই। বাৎসরিক পুজোর তিনদিন এই ঢোলদুটোকে নামিয়ে নিরাকার সাংজা দেবতার নামে বাজানো হয়। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

## 'আধুনিক' শিক্ষা এবং 'আধুনিক' জীবিকা

টোটোপাড়ায় ১৯৬০-এর মার্চে নৃতাত্ত্বিক চারুচন্দ্র সান্যাল দেখেছিলেন :

> বহু টোটোই ভাঙা বাংলা বলতে পারে। কিন্তু সাক্ষরতার কোনও অগ্রগতি এখনও ঘটেনি। টোটোদের ভাষা চর্চা করবে এবং তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের প্রাথমিক পাঠ দেবে এমন কেউ নেই। তেমন কেউ থাকলে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের উৎসাহ বাড়ত। (সূত্র ১, পৃ. ৩২, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

১২ বছর পর, ১৯৭২-এর নভেম্বরের চারুচন্দ্র সান্যাল টোটোপাড়ায় দেখেছিলেন :

> একটা বড়ো স্কুলঘর বানানো হয়েছে যেখানে অনুঘা এক্কা নামে এক ওঁরাও হলেন শিক্ষক এবং ৫৫ জন ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে নাম লিখিয়েছে। (সবাই টোটো এমনটা লেখক বলেননি, সুতরাং ধরা যেতে পারে যে এর মধ্যে বড়ো সংখ্যায় নেপালিরা আছেন।—বর্তমান লেখক) সম্প্রতি স্কুলটিকে জলপাইগুড়ি স্কুল বোর্ডের অধীনস্থ করা হয়েছে। দেখলাম যে বহু টোটোই বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছে। (সূত্র ১, পৃ. ৩৪, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

তার আবার ২৪ বছর পর, ১৯৯৬ সালে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদার লিখেছেন :

> বর্তমানে টোটোপাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, গ্রামপঞ্চায়েতের সব কাজকর্ম বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীরাও বাংলাভাষী। ফলে টোটোপাড়ায় বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ও বর্তমানে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নতুন যুগের টোটো যুবক-যুবতীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছেন। শ্রীমান ধনীরাম টোটো বাংলা ভাষার মাধ্যমে গল্প লেখার কাজও শুরু করেছেন। এভাবে টোটো জনজাতি ক্রমশ দেশের মূল সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নিজেদের মিলিত হবার প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে সংস্কৃতি গ্রহণের এই প্রবাহ এখনও টোটো জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬২)

সম্প্রতি, ২০১২ সালে, ভাষাতাত্ত্বিক সুধীরকুমার বিষ্ণু টোটোপাড়া সম্পর্কে লিখেছেন :

> একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল এবং শেষ চার দশক ধরে তারা শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেবলমাত্র স্কুল নয়, টোটোপাড়া এখন সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক, সরকারি দফতর, অতিথিশালা, গ্রামীণ পাঠাগার, ভিডিও প্রেক্ষাগৃহ, হোটেল, দোকান এবং আধুনিক জীবনের আরও বহু উপকরণ দিয়ে। নিয়মিত বাস পরিষেবা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। নেপালি, বাঙালি ও হিন্দিভাষী মানুষজনের সঙ্গে ঘনঘন সংস্পর্শে আসা টোটো সমাজকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। তার ফলে টোটোরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে,

এমনকি তাদের মাতৃভাষাও হারিয়ে ফেলছে। (সূত্র ৫, পৃ. ৩২, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের।)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা দেখি যে :

১. ১৯৭০-এর দশক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন টোটোপাড়ায় হয় মূলত বাংলা ভাষা মাধ্যমে। টোটোদের নিজস্ব ভাষা, অর্থাৎ টোটো ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি।

২. এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে টোটো সমাজের যে অংশ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির চর্চায় 'আগ্রহী' হয়ে উঠেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৯৯৬ সালে) এসেও দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা 'জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি', যা ইঙ্গিত করে যে হয় তাঁরা টোটো সমাজের খুব ছোটো একটা অংশ, অথবা তাঁরা এমন একটা অংশ যাঁরা 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে টোটো সমাজ থেকে একপ্রকার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে ফেলছেন, অথবা একসঙ্গে এই দুটোই, যার ফলে 'জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে' তাঁদের প্রভাব খুবই কম। এই ইঙ্গিতগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কতটা সত্য?

৩. ২০১২-তে স্কুল ছাড়াও 'আধুনিক জীবনের আরও বহু উপকরণের' যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক, সরকারি দফতর, অতিথিশালা, গ্রামীণ পাঠাগার ইত্যাদি পূর্বোল্লেখিত অল্পসংখ্যক টোটো প্রাতিষ্ঠানিক-শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিকল্প জীবিকার, অর্থাৎ বেতনভূক কর্মচারী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে। ফলে টোটো সমাজে একটি নতুন স্তর—সরকারি কর্মচারী বা বেতনভূক কর্মচারী—আয়তনে ছোটো হলেও, তৈরি হচ্ছে। তাছাড়াও, যে কয়জন এই সমস্ত চাকরি পাচ্ছেন, তার চেয়ে একটা অনেক বড়ো অংশের কাছে এমন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা একটা বাস্তব সম্ভাবনা হিসাবে হাজির হতে বাধ্য এবং পূর্বালোচিত জীবিকার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তা আকর্ষণীয় হয় উঠতেও বাধ্য। ফলস্বরূপ, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পথ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আকর্ষণও বাড়তে বাধ্য। এইভাবেই কি ক্রমশ আরও ব্যাপক সংখ্যক টোটো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা-মাধ্যম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে, নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলছে?

এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর তৈরির জায়গা কি আমরা ২০১৫ সালের জুনে টোটোপাড়ায় আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেলাম? তাই-ই এবার দেখা যাক। আমাদের আলাপচারিতা যে তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে হতে পেরেছে, সেই ধনীরাম টোটো, সত্যজিৎ টোটো ও উদয় টোটো তিনজনেই টোটোদের মধ্যে সেই অল্পসংখ্যক জনেদের মধ্যে পড়েন যাঁরা মাধ্যমিক পাশ করেছেন। প্রথম দুইজন বাংলা বলা, লেখা ও পড়ায় খুবই সাবলীল—টোটো ভাষায় লেখা তাঁদের নিজেদের কবিতা তাঁরা নিজেরাই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে থাকেন, ধনীরাম টোটো বাংলা গদ্যও সাবলীলভাবে লিখতে দক্ষ। তৃতীয়জন, অর্থাৎ উদয় টোটো, বাংলা পড়া বা লেখায় সমর্থ নন, বলতে পারেন ভাঙা-ভাঙা। এই তিনজনই বাংলা ও ইংরাজি শেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন সরকারি বা বেসরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য। গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরি পাওয়া ভক্ত টোটো, সরকারি আদিবাসী কল্যাণ দফতরে চাকরি পাওয়া ধনীরাম টোটো, স্কুলে পার্শ্বশিক্ষকের চাকরি পাওয়া সদ্যপ্রয়াত জগদীশ টোটো এবং কলকাতায় টাটার কোম্পানিতে কাজ পাওয়া টোটোদের মধ্যে প্রথম মহিলা স্নাতক রীতা টোটো তাঁদের সামনে উদাহরণ। সত্যজিতের নিজের সহোদর শিক্ষিত এবং যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের চাকরি না পাওয়ায় সত্যজিৎ ক্ষোভও প্রকাশ করেছে—সরকার কোনও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত না করায় গ্রন্থাগারটি এখন বন্ধ হয় পড়ে আছে। এঁরা তিনজনই বর্তমান সময়ে বাংলা শেখার থেকেও ইংরাজি শেখার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা বাড়ানোর দিক থেকে। তিনজনেই সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন টোটোপাড়ার ভিতরেই বিদেশী এনজিও সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা 'চিত্তরঞ্জন টোটো মেমোরিয়াল স্কুল'-এর যেখানে একেবারে বাচ্চাদের ইংরাজি অক্ষর ও শব্দের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা হয়। আমরা যে অতিথিশালায় থাকতাম, তার সামনেই এই একঘরের ইংরাজি শেখার স্কুল—কুড়িজনের মতো বছর সাত-আটের ছেলেমেয়েদের আমরা সেখানে পড়তে দেখেছি। ধনীরাম, সতজিৎ বা উদয়—তিনজনের কেউই বাংলা বা ইংরাজি ভাষাকে চাকরি বা কাজের মাধ্যম হিসেবে নেওয়ার সঙ্গে টোটোভাষা চর্চার কোনও বিরোধ বা বৈরিতা আছে বলে স্বীকার করেননি। এঁরা নিজেরা টোটোভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। উদয় টোটো তো আমাদের সটান বলেই দিলেন যে তাঁরা আমাদের বাংলা ভাষা কষ্ট করে শিখছেন, আমাদেরও উচিত তাঁদের টোটো ভাষা শেখা—কেবল তাঁরাই বাংলা শিখবেন এমনটা ঠিক নয়। সত্যজিৎ টোটো কবিতা লেখেন,

গান বাঁধেন টোটো ভাষায় আর নিজেই সুর দিয়ে টোটো বাচ্চাদের মাঝে গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেইসব গেয়ে শোনান। এভাবে সেই বাচ্চাদের কণ্ঠেও তিনি টোটো ভাষার গান তুলে দেন, বাৎসরিকভাবে নাচ-গানের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন তাদের নিয়ে। এভাবেই তিনি টোটো ভাষাকে সজীব রাখতে চান। টোটোদের প্রথাগত গান ও প্রথাগত পোশাকও বাচ্চাদের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা সত্যজিৎ চালিয়ে যাচ্ছেন—এই ব্যাপারে তিনি আশাবাদীও বটে। ধনীরাম টোটো কবিতা, গদ্য, লোককথা টোটো ভাষা ও বাংলা ভাষা—এই দুই ভাষাতেই লেখেন। তিনি গুরুত্ব দিলেন বাচ্চাদের টোটো ভাষায় পড়া-লেখা-র ব্যবস্থা তৈরি করার উপর। এই ভাবনা থেকে তিনি টোটোভাষার নিজস্ব লেখ্য রূপ তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিলেন। এই প্রয়োজন মেটাতে তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন। টোটো ভাষা ছিল একটি কথ্য ভাষা, তার কোনও লেখ্য রূপ ছিল না। ১৯৭০-এর দশক থেকে বাংলা ভাষা মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শিকড় গাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হরফে টোটো ভাষা লেখার রীতির প্রচলন হয়। এখনও তাই-ই চালু আছে। ধনীরাম টোটোর বক্তব্য এই যে টোটো ভাষার বহু ধ্বনিই বাংলা অক্ষরের মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব, তাই টোটো ভাষাকে অবিকৃত রেখে তার লেখ্যরূপ নির্মাণ করতে হলে প্রয়োজন টোটো বর্ণমালা। টোটোপাড়ায় গবেষণার কাজে যাওয়া ভাষাতাত্ত্বিক টোবি অ্যান্ডারসনের সাহায্য-সহায়তায় ধনীরাম টোটো একটি নতুন বর্ণমালা তৈরি করেছেন যা টোটো ভাষার ধ্বনিসমূহকে প্রকাশ করতে পারবে। প্রতিটি টোটো ধ্বনিমূলের প্রতীক হিসাবে অক্ষর তৈরি করার সময় তিনি জোর দিয়েছেন যাতে সেই অক্ষরের 'ছবি'-রূপ আভাস বহন করে সেই অক্ষরে নাম শুরু এমন কোনও অতিপরিচিত বস্তুর আকারের। ধনীরাম বলেছেন যে তিনি তা করেছেন এইজন্য যাতে টোটো শিশুদের পক্ষে সহজ ও সহজাতভাবে এই বর্ণমালা আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয়। 'চিত্তরঞ্জন টোটো মেমোরিয়াল স্কুল'-এর ঘরেও তিনি একটি বড়ো দেওয়ালপত্রে এই বর্ণমালা লিখে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছেন যাতে সেখানে পড়তে আসা বাচ্চারাও দেখতে দেখতে এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন টোটোর এইভাবে টোটোদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য সচেতন ভূমিকা নেওয়া এইটা প্রমাণ করে না যে টোটো ভাষা ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কার মুখে দাঁড়িয়ে নেই। বরং উল্টোদিক থেকে এইটাই বলা যায় যে তেমন বিলোপের আশঙ্কাই ধনীরাম বা সত্যজিতকে উপরোক্ত ভূমিকা পালনের দিকে ঠেলছে। সত্যজিতের কথায় উঠে এসেছে যে টোটোদের বহু পুরানো গান হারিয়ে যাচ্ছে, পুরানো গানের ভাষাও এখনকার বহু টোটো তরুণের কাছে অবোধ্য ঠেকছে। বাংলা ও নেপালি শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে বহু টোটো শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। টোটো ভাষা ও সংস্কৃতি বিলোপের দিকে যাওয়ার নানা কারণ হিসাবে ধনীরাম টোটো যেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, সেইগুলো হল : নেপালিদের সঙ্গে সংমিশ্রণ, নেপালিদের প্রভাব, অর্থ রোজগারের জন্য ক্রমশ টোটো সমাজের গণ্ডী ছেড়ে বার হওয়ার বহির্মুখী টান। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভক্ত টোটো, ধনীরাম টোটো, সত্যজিৎ টোটোদের প্রজন্মে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা চাকরি পেলেও তা মূলত টোটোপাড়ার মধ্যেই স্কুল বা সরকারি দফতরে পেত। রীতা টোটো টাটার কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে টোটোপাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর এখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষিতদের মধ্যে এমনভাবে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ বাড়ছে। ফলে ধনীরামের মতো শিক্ষিতদের নিজস্ব চেতনা ও পরিচয়ের শিকড় যেভাবে টোটো ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত ছিল বা আছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিতদেরও তেমনটাই থাকবে কি না—তাও একটা বড়ো প্রশ্ন।

**টোটোসমাজের গড়ন**

টোটোসমাজ চোদ্দটি গোষ্ঠী এবং চারটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। চোদ্দোটি গোষ্ঠীর নাম হল : (১) বাঙগাবে, (২) বৌদুবে, (৩) বুদুবে, (৪) ধিরিংচান কোবে, (৫) নুরিন চান কোবে, (৬) মাংত্রচে, (৭) মানচিংচে, (৮) দাংএবে, (৯) নুবেবে, (১০) রেকানজিবে, (১১) নিশবান কোবে, (১২) দিগবে, (১৩) বানাংনা, এবং (১৪) জংকোবে। চারটি উপগোষ্ঠীর নাম হল : (১) মাইপা, (২) জাপা, (৩) মাচপা, এবং (৪) থাপা। আগেই বলেছি যে টোটোদের বিশ্বাস টোটোপাড়ায় বসত-প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রথম যে চোদ্দটি টোটো পরিবার, এক একটি গোষ্ঠী সেই এক একটি পরিবারের বংশ। প্রথাগতভাবে এক একটি গোষ্ঠীর মানুষরা টোটোপাড়ার এক এক অঞ্চলে বাস করতেন, প্রতিটি গোষ্ঠীর একটা সাধারণ ঘর থাকত গোষ্ঠীগত আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এবং গোষ্ঠীবিশেষে কবরস্থানও আলাদা আলাদা হত। বাঁদর ও কাঠবিড়ালির মাংস খাওয়া বা না খাওয়া এবং ডয়া, ড্রুকপা-র মতো ভুটিয়াদের সঙ্গে মেশা বা না মেশা—এমন প্রশ্নে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ফারাক থাকত। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সাধারণত নিষিদ্ধ ছিল, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর

মধ্যে হওয়ারই চল ছিল। টোটোদের সঙ্গে অ-টোটোদের বিবাহের উপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের জাতপাতপ্রথাকে মেলানো সম্পূর্ণ ভুল হবে, কারণ, এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সামাজিক মেলামেশার নিরিখে কোনও বাধা ছিল না এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কোনওটা উঁচু, কোনওটা নীচু—সম্মান বা ক্ষমতার এমন কোনও বিভাজনও ছিল না। যেমন ধরা যাক, বুদুবে গোষ্ঠীর মানুষদের উপরই দায়িত্ব থাকে টোটোদের উপাসনাস্থল 'দেমসা'-র রক্ষণাবেক্ষণের এবং বিয়ে বা মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করার। কিন্তু, সনাতন হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা যেমন সামাজিক সোপান- তান্ত্রিকতায় উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন, তেমন কোনও আলাদা ক্ষমতা বা মর্যাদা বুদুবে-দের নেই।

টোটো সমাজ প্রথাগতভাবে একটি গ্রামীণ পরিষদের ধাঁচায় গঠিত হত। এই গ্রামীণ পরিষদের বিশেষ অধিকারিকরা এবং তাদের ভূমিকা ছিল এইরকম :

**১. কাইজি :** ইনি টোটোসমাজের ধর্মীয় প্রধান। বংশানুক্রমিকভাবে এই পদ পূরণ হত। এঁর বিশেষ দায়িত্ব ছিল সামাজিক রীতি-নীতি বা আচরণের বিষয়ে কোনও অসমাধিত প্রশ্ন দেখা দিলে তা গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা।

**২. গাপ্পু বা মণ্ডল :** ইনি টোটোসমাজের ব্যবহারিক-বৈষয়িক ক্ষেত্রের প্রধান। এই পদটিও বংশানুক্রমিকভাবে পূরণ হত। চাষের জমি, পশুচারণের জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও বিবাদ দেখা দিলে ইনি সমস্ত গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে তার সমাধান করতেন।

**৩. পঞ্চায়েত :** এঁর মূল দায়িত্ব ছিল চৌকিদারি খাজনা নির্ধারণ করা এবং গ্রামের সকলের কাছ থেকে তা আদায় করা। এছাড়াও, ছোটোখাটো বিবাদ-বিসংবাদ মেটানোর কাজ গ্রামের বয়স্কদের মতামত নিয়ে করাও এনার কাজের মধ্যে পড়ত।

**৪. নামপন বা সংবাদবাহক :** এঁর দায়িত্ব কাইজি ও মণ্ডলের মত/নির্দেশ গ্রামের সবার মধ্যে প্রচার করা।

**৫. চৌকিদার :** ইনি পঞ্চায়েতের অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশমতো কাজ করতেন।

**৬. পাও :** কারও অসুখ করলে মন্ত্রপাঠ বা কবিরাজি ওষুধ দেওয়া, নতুন কারও জন্ম হলে বিজোড়সংখ্যক দিনে গিয়ে তার নামকরণ করা, উৎসব অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করা—এইসব ছিল তাঁর দায়িত্ব।

টোটোদের গোষ্ঠীগত জীবনাচরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে এই সমাজগড়ন রূপ নিয়েছিল। জীবিকার বিবর্তন/পরিবর্তন, গোষ্ঠীগত চৌহদ্দির বাইরে মানুষজনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগ/মিশ্রণ, বহিঃজগতের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সম্পর্ক ক্রমনিবিড় হওয়া—এই সবের প্রক্রিয়ায় এই সমাজগড়ন নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। সেই দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক।

টোটোপাড়ার গ্রামের একখণ্ড ছবি : পিছনে পুরানো ধাঁচার বাড়ি, সামনে নতুন ধরনের ঘর একটা সম্পূর্ণ, আর একটা নির্মীয়মান। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

টোটোপাড়ায় প্রথম 'আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র' স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে 'ভারত মহাজাতিমণ্ডলী' নামক এন জি ও ব্যবস্থাপনায় এবং তার আর্থিক দায়ভার পুরোপুরি সরকার বহন করেছিল। মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যোগেন্দ্রনাথ সরকার টোটোপাড়ায় থেকে টোটোদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। টোটোদের মধ্যে নিজেকে ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'পরিচ্ছন্নতা', 'স্বাস্থ্যবিধি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে টোটোদের অভ্যাস পরিবর্তন ও সরকারি সাহায্য হিসাবে সাবান, দুধ, কিছু ওষুধ বিবরণের মধ্য দিয়ে টোটোদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সচেষ্ট হন। বাংলা ভাষা মাধ্যমে শিক্ষারও সূচনা করেন। ১৯৫৪ সালে হঠাৎই যোগেনবাবু ব্যাখ্যারহিতভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এই ঘটনার পরে ১৯৫৫ সাল থেকে সরকার এই আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্রের দায়ভার সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়, ডি এস রানা নামে এক সরকারি আধিকারিক নিযুক্ত হন এই কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে। ডি এস রানা বিভিন্ন সরকারি শাখার সঙ্গো যোগসূত্র রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করেন যাতে এই সমস্ত শাখার প্রভাবের শিকড় এই অঞ্চলে গাড়া যায়। সরকারি সাহায্য যা অনুদান হিসাবে নানা দান-খয়রাতি টোটোদের মধ্যে বিতরণ করা,

আশপাশের চা-বাগানে বা স্থানীয় বাজারে টোটোদের বাঁশ বিক্রিকে একটা সংগঠিত নিয়মিত রূপ দেওয়ার জন্য 'এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি' তৈরি করা, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে টোটোদের উপর ও তাদের কাজকর্মের উপর নিয়মিত তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য-পঞ্জি তৈরির কাজ করা ইত্যাদি করতে থাকেন। ১৯৬৯ সালের সরকারি জমি জরিপ কাণ্ড, যার মধ্য দিয়ে টোটোদের গোষ্ঠী-মালিকানাভুক্ত ৮০% জমি তাঁদের হাতের বাইরে চলে গেল ও জমির উপর ব্যক্তিমালিকানার ধারণা জোর করে বাইরে থেকে আমদানি করা হল, সেই কাণ্ডেও এই আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই সমস্ত সরকারি আধিকারিক, সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে টোটোদের সম্পর্ক কীরকম ছিল? ১৯৫৩ সালে চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছিলেন : "তারা (টোটোরা) সরকারের বনরক্ষী এবং আধিকারিকদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের ভয় করে বলেই সম্মানও করে।" (সূত্র ১, পৃ. ২৭) এই ভয়-সম্মানের উল্টোপিঠে ছিল 'সহায়তা'র নামে দান-খয়রাতির ডালি—বাড়ি বানানোর জন্য হাতে গোনা কয়েকজনকে সরকারি 'সাহায্য', বাইরের পণ্য প্রাথমিকভাবে বিনা পয়সায় সরবরাহ করে তা ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা (যেমন বাইরের সাজ-পোশাক, রেডিও, ভোগ্যদ্রব্য), ইত্যাদি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য এইসময় কী ছিল? তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৬৯ সালে টোটোপাড়ায় গিয়ে কাজ করা সরকারের অন্যতম বরিষ্ঠ আধিকারিক অমলকুমার দাসের সেই সময়ের লেখায় :

> (টোটোপাড়ায় নেওয়া) জনহিতকর ব্যবস্থাগুলোর সাফল্যের জন্য গ্রামের সংগঠনকে জোরদার করে তোলার এবং এই জনজাতির কাম্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, যাদেরই ব্যবহার করা যাবে এই উপজাতির মধ্যে উন্নতিকে হজম করানোর সহায়ক-বস্তু হিসাবে। কিছু তরুণ টোটোকে বেছে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এই সূত্রে দীনেশ, রমেশ, রবি, হরকে, দুরসে, গরবে, লাসে-দের মতো টেটোদের নাম করা যায়। বেশ ঘনঘন তারা শার্ট-প্যান্ট পরে, সিনেমা দেখতে যায়, অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও তারা বাইরের বহু জিনিসকে তাদের সমাজে চালু করার চেষ্টা করছে। এই তরুণ টোটোরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের রেডিও প্রোগ্রাম শোনে (টোটো গ্রামে একটা/দুটো ট্রানজিস্টার রেডিও পাওয়া যাবে)। যদিও বেশিরভাগ টোটো হিন্দি সিনেমার গানে ও নেপালি গানে আগ্রহী, এই তরুণ টোটোরা নেপালি ভাষায় সম্প্রচারিত খবরও শোনে, যার মধ্যে দিয়ে বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে তারা খোঁজখবর রাখে। এদেরই ধরা যেতে পোরে এই জনজাতির মধ্যের নতুন মেজাজের মাপক হিসাবে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা করে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের আদিবাসী জীবনকে নতুন স্থায়িত্বে ঢালাই করার উপযোগী সংকর-ধাতু হিসাবে। (সূত্র ৩, পৃ. ১২২-১২৩, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের।)

কেবল রেডিও, প্যান্ট-শার্ট, সিনেমা, ভোগ্যবস্তু-র প্রতি আকর্ষণ নয়, টোটো সমাজের মধ্যে এই 'নতুন মেজাজের মাপক'-দের সম্বন্ধে চারুচন্দ্র সান্যালের ১৯৫৩ সালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় :

> গারগাপা-র বর্তমান নাম দীনেশ টোটো। তার এই নতুন নামকরণ করেছেন সদ্যপ্রয়াত যোগেন সরকার যিনি কয়েক মাস টোটোদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। সে এলে দেখলাম যে সে বেশ বড়ো হয়ে গেছে। তার পরনে একটা হাফপ্যান্ট ও শার্ট, টোটো প্রাপ্তবয়স্করা যে প্রথাগত 'অ্যাং ডাং' নামক পোশাক পরে তার পরিবর্তে। দীনেশের সঙ্গে এল আরেকটি ছেলে, লম্বা খাঁকি প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে—সেও নাম বদলে একটা বাঙালি নাম নেওয়ার কথা ভাবছে। (সূত্র ১, পৃ. ৩০, ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

এই সবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দফতরের পৌরোহিত্যে সরকারি সাহায্য অনুদান ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন টোটোদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত করে তুলল, পণ্য ও ভোগবস্তু কিছুটা মাত্রায় তাদের কাছে লভ্য করে তুলল, অন্যদিকে তেমনই নিজেদের পোশাক, নিজেদের ভাষা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরা, বাংলায় নাম রাখাকে 'আধুনিকতা-অগ্রগতি'-র সমতুল বলে ধরল।

১৯৬৯-এর আগে থেকেই টোটোপাড়ায় নেপালিরা বেশ ভালো সংখ্যায় বসতস্থাপন করেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ফলে টোটোদের চিরাচরিত গ্রামীণ পরিষদের ধাঁচা—যা কেবল টোটোদের নিয়েই তৈরি—তা গোটা টোটোপাড়ায় সমাজ-সংগঠনের কাজে আর যথেষ্ট হয়ে উঠছিল না। সরকারি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা সরকারি আধিকারিকদের উপর থেকে করা সংস্কার হিসাবে এলেও তা গৃহীত হওয়ার পিছনে চিরাচরিত টোটো গ্রামীণ পরিষদের নেপালি ও টোটো জনগণের সমবায়কে ধারণ করার অক্ষমতাও কাজ করেছিল।

১৯৬৯ সালে পূর্বকথিত 'অদ্ভুত ভূমিসংস্কার' হওয়ার সময় টোটোপাড়া গ্রামপঞ্চায়েত ছিল নয়জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত—তার মধ্যে ৬ জন নেপালি ও ৩ জন টোটো। তিনজন টোটো সদস্য ছিলেন আমেফা টোটো, দীনেশ টোটো ও লামসিং টোটো। আমেফা টোটো ছিলেন নির্বাচিত গ্রাম-অধ্যক্ষ।

এই আমেফা টোটোই হলেন টোটোসমাজের প্রথাগত গ্রামীণ পরিষদের শেষ বংশপরম্পরাগতভাবে নিযুক্ত পঞ্চায়েত। ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারি গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়মিতভাবে চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামীণ পরিষদে বংশানুক্রমিকভাবে 'পঞ্চায়েত' নিযুক্ত হওয়ার প্রথা উঠে গেছে।

টোটোপাড়া বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট ব্লকের টোটোপাড়া-বল্লালগুড়ি গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সেই মেতাবেক বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিয়মিত চক্রের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে দেশজোড়া কেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থার অধীন সে চলে এসেছে। ফলে গ্রামীণ পরিষদের কিছু পদে, যেমন কাইজি-র পদে, বংশানুক্রমিক নিযুক্তি এখনও বহাল থাকলেও তা ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।

ধনীরাম টোটো—টোটোপাড়ার অতিথিনিবাসের ঘরে আড্ডায়।
(চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

২০১৫ সালের জুনে মাঠে-ময়দানে এ-সবের কী প্রকাশ আমরা দেখলাম—সেই কথা এবার কিছু বলা যাক। টোটোপাড়ায় পুরুষদের মধ্যে প্রথাগত পোশাক অ্যাং ডাং পরার চল পুরোপুরিই উঠে গেছে। মহিলাদের মধ্যেও উঠে গেছে বললেই চলে—বয়স্ক দুই-একজন মহিলা এখনও সেই পোশাক বুনতে পারে ও পরে বলে আমরা শুনলাম, কিন্তু দেখিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা ও টোটোদের মধ্যে বাংলায় নাম রাখার প্রচলন এখন ব্যাপক। সত্যজিৎ, জগদীশ, ভক্ত, সনজিৎ, বকুল, রবি, রীতা, শোভা—এমন বহু বহু নাম। উদয় টোটো-র নাম 'উদয়'-টাও তো বাংলাতেই, যদিও সে নিজে বাংলা বলা বা লেখায় স্বচ্ছন্দ নয়। ফলত বাংলায় নামকরণ 'আধুনিকতা' বা 'অগ্রগতির' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। সত্যজিৎ টোটো সাধারণভাবে প্রথাগত পোশাক ব্যবহার না করলেও বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে প্রথাগত পোশাক ব্যবহার করার পক্ষে, এটা তাঁর কাছে জাতিগত আত্মসম্মানের বিষয়। এই বিষয়ে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগও নিচ্ছেন। টোটোদের প্রথাগত উৎসবের সময়গুলোতে টোটো শিশু কিশোরদের নিয়ে টোটোদের প্রথাগত পোশাক পরে নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তিনি সংগঠিত করে থাকেন। টোটোদের প্রথাগত ঘর নির্মাণের কৌশল ছেড়ে পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ এখন যাদের পক্ষে সম্ভব তারা করছেন—এ ব্যাপারে অবশ্য সত্যজিতের বক্তব্য এই যে পুরানো ঘরের চেয়ে নতুন পাকা ঘরেই থাকার সুবিধা অনেক, তাই টোটোরা কেন সে সুবিধা নেবে না? ধনীরাম টোটো এ বিষয়ে তাঁর একটা সাম্প্রতিক লেখা দেখালেন, যেখানে তিনি লিখেছেন :

> এই সহজ সরল জনজাতি (টোটো) প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে যুগের পর যুগ তাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষাকে বহন করে চলেছে। আধুনিক সমাজ নিয়মে আবদ্ধ হয়ে মূলস্রোতে তাল রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে আধুনিকতার পথে।...তবে বর্তমানে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায় তার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা ইত্যাদির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে কঠিনতর সংগ্রামের সম্মুখীন। আধুনিক কালের নিয়মে টোটো জনজাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি P : Population, Politics, Pollution অর্থাৎ জনসংখ্যা, রাজনীতি, দূষণ। (সূত্র ৬)

ধনীরাম টোটোর মধ্যে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার ইচ্ছার পাশাপাশি নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা নিয়ে গর্ব ও তা

বিলোপের আশঙ্কা—এই দুইই যে আছে তা তাঁর উপরের লেখায় যেমন, তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতাতেও তেমনই বারবার উঠে এসেছে। টোটো সমাজে চুরি-ডাকাতি অজানা, আজ অবধি কোনও টোটো মানুষ গ্রামে বা গ্রামের বাইরে এই অপরাধে অভিযুক্ত হয়নি, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জন্মের বহু আগে থেকেই টোটো সমাজে বিধবা বিবাহ স্বাভাবিক ঘটনা, বহুবিবাহ সাধারণভাবে টোটো সমাজে প্রচলিত নয়, মহিলাদের উপর লিঙ্গবৈষম্য প্রায় নেই, যৌননিপীড়নের ঘটনা এ সমাজে অজানা—এই সমস্ত তুলে ধরে ধনীরাম টোটো টোটোদের প্রথাগত সমাজ-সংগঠন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গর্ব প্রকাশ করেন, বলেন যে 'আমরা অনেক ভালো আছি' (কাদের তুলনায় অনেক ভালো আছেন? তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে যাঁরা তাঁদের 'নোংরা', 'কুসংস্কারগ্রস্ত', 'অসভ্য' বলে 'সভ্য আধুনিক, আলোক-প্রাপ্ত' করে তোলার 'গুরুদায়িত্ব' নিজেরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁদের তুলনায়।) একইসঙ্গে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি, তা নিয়ে জানা বোঝা, নিজস্ব ধারণা তৈরি করাতেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ও সক্রিয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় আছে। কেবল তাই নয়, ভুটান, নেপাল, তিব্বত, চীনের সমাজ-ইতিহাস থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, বাংলার 'নবজাগরণ'—

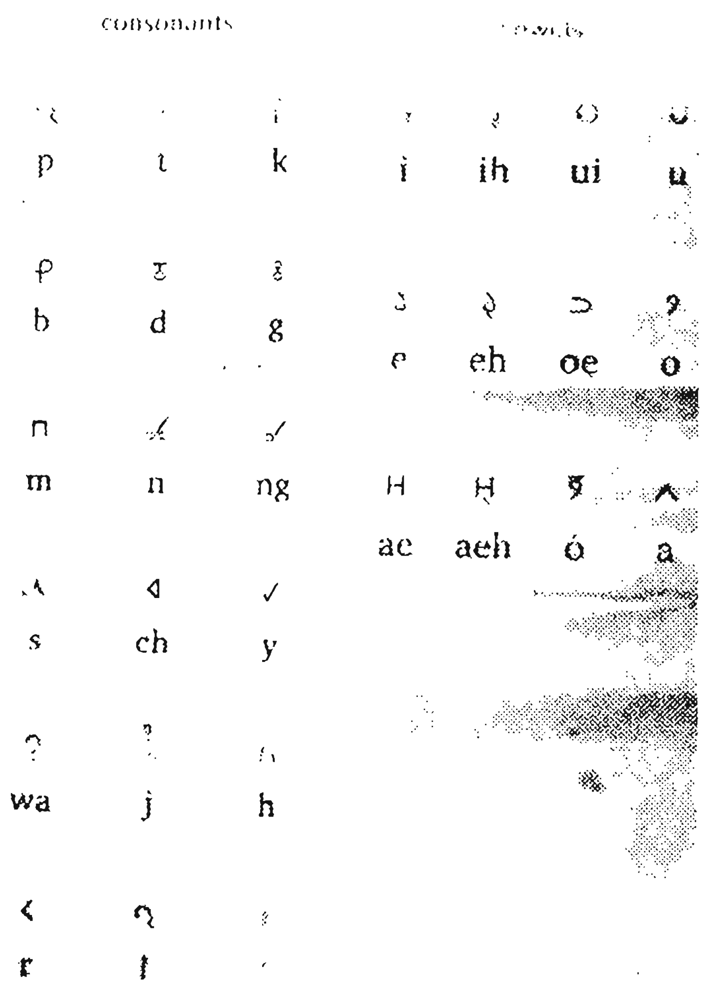


ধনীরাম টোটোর তৈরি টোটোবর্ণমালা। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর নিজস্ব বেশ কিছু মতামত আছে। আবার তিনিই তাঁদের নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির 'নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে কঠিনতর সংগ্রামের' প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেন তিনটি, P-কে—Population, Politics, Pollution। এই তিনটি 'P' দিয়ে তিনি আসলে কী বলতে চাইছেন? আলাপচারিতার মাধ্যমে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। যা বুঝতে পেরেছি তা বলি। জনসংখ্যা হ্রাস হয়ে একসময় প্রায় লুপ্ত হতে বসা টোটো জাতি এখন সেই বিপদ কাটিয়ে উঠে লাগাতারভাবে তার জনসংখ্যা বাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। কয়েকশো থেকে এখন তাদের জনসংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু চিরাচরিতভাবে যে ভূখণ্ড তাঁরা নিজেদের শ্রম দিয়ে বাসভূমি ও কর্মভূমি হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, তার ৮০%-ই এখন তাঁদের হাতছাড়া, সে ভূখণ্ডে এখন নেপালিদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যালঘুও বটে। এছাড়াও তাঁদের চিরাচরিত জীবিকাগুলো এখন আর সবার জীবিকাপ্রদান করতে অসমর্থ, নতুন জীবিকা বা আধুনিক জীবিকাও গুটিকয়কেই আশ্রয় দিচ্ছে, ব্যাপক অংশের কাছে চাকরি, ব্যাবসার মতো সেসব আধুনিক জীবিকা নাগালের বাইরে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তাঁদের কাছে কেবলমাত্র আশীর্বাদ না থেকে জীবন-জীবিকার সংকটকেও আরো ঘনীভূত করে তুলছে। আর এখানেই কাজ করছে দ্বিতীয় P অর্থাৎ Politics। সরকার

দান-খয়রাতি, ছোটো একটা সুবিধাভোগী অংশ তৈরি করার মাধ্যমে যে রাজনীতি চালু করেছে তা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বগর্বে বাঁচার পরিবর্তে দান-খয়রাতির জন্য আবেদন-নিবেদন ও ক্ষমতাবানদের তুষ্ট করার পরনির্ভরতা-পরমুখাপেক্ষিতার জন্ম ও প্রসার ঘটাচ্ছে— ক্রমশ যা নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে অন্যের অক্ষম অনুকরণের প্রবণতা বাড়াচ্ছে। একে কেন্দ্র করেই টোটোদের সমাজে যা অপ্রচলিত ছিল, সেইসব দূষণ (Pollution) প্রবেশ করছে। ধনীরামের চোখে এই দূষণের একটা প্রধান রূপ হচ্ছে ঘুষের সর্বময় প্রচলন—ওপরতলাকে সন্তুষ্ট করা বা অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা—এইসব চিন্তার আগাছা এখন টোটোপাড়ার মাটিতেও মাথা তুলছে। এইসবের বিরুদ্ধেই ধনীরাম টোটো কঠিনতর সংগ্রামের কথা বলেছেন, যে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল টোটোদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য টিকে থাকতে পারে আধুনিকতার পর্যায়ে প্রবেশ করেও।

ফলত, বোঝা যায় যে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগ ও সংস্পর্শ টোটো সমাজের মধ্যে 'ক্ষমতাশালী আধুনিকতা'-র কাছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের একরৈখিক কোনও প্রক্রিয়া শুরু করেনি, বরং বহুমাত্রিক বহুস্বরীয় মন্থন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। সেইখানে আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদন যদি থাকে, তবে তার পাশাপাশি যাচাই বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করার আত্মবর্গী আত্মসচেতনতাও আছে।

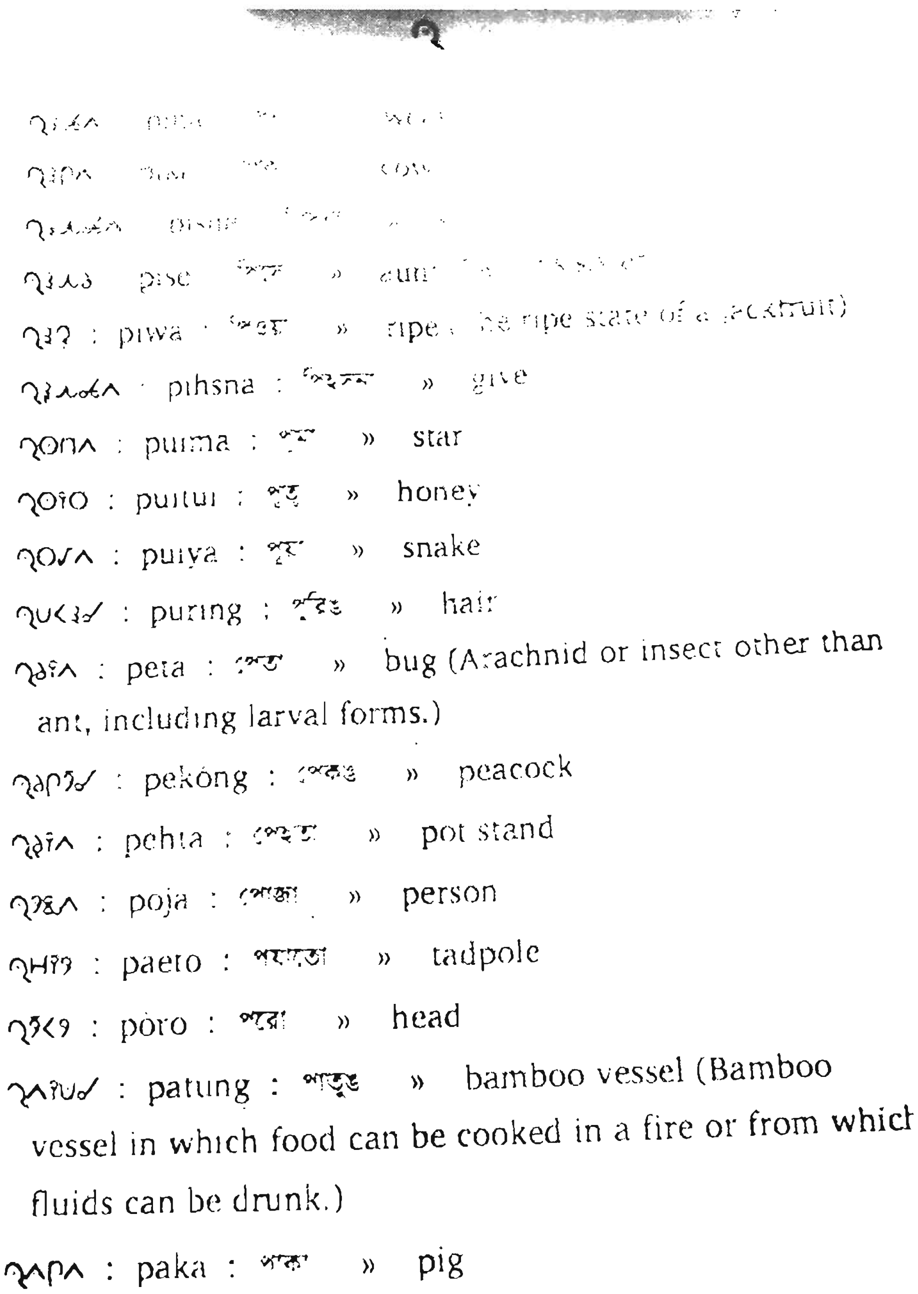


ধনীরাম টোটোর তৈরি করা অক্ষরে টোটো শব্দমালার একটি পাতা। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

এই মন্থন প্রক্রিয়া, এই বহুমাত্রিক বহুস্বর টোটোপাড়াকে ঘিরে রাখা অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির মতোই আকর্ষণীয়। তা কেবল একবারের চারদিনের আবাসের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি জানাবোঝার নয়। আমাদের তাই আবার টোটোপাড়ায় যেতে হবে, বারবার যেতে হবে—জানাবোঝার জন্য, নিজেদের ঋদ্ধ করার জন্য।

## সূত্রনির্দেশ


১. চারুচন্দ্র সান্যাল লিখিত 'দি মেচেস অ্যান্ড টোটোস : টু সাব-হিমালয়ান ট্রাইবস অফ নর্থ বেঙ্গল', দক্ষিণবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।

২. বি কে রয় বর্মন দ্বারা ১৯৬৪ সালে তৈরি করা সরকারি প্রতিবেদন 'এ নোট অন দি সোসিও মেডিকাল সার্ভে অ্যামঙ দি টোটোস'।

৩. অমলকুমার দাস লিখিত 'দি টোটোস', ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট' কর্তৃক প্রকাশিত।

৪. বিমলেন্দু মজুমদার লিখিত প্রবন্ধ 'টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ও সংস্কৃতি' যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র পত্রিকা 'লোকশ্রুতি'-র ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫. সুধীরকুমার বিষু লিখিত 'এ ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অফ টোটো ল্যাংগুয়েজে' গ্রন্থি, ২০১২ সালে কলকাতার 'দি শী বুক এজেন্সি' কর্তৃক প্রকাশিত।

৬. ধনীরাম টোটো লিখিত 'টোটো জনজাতির সমাজজীবন' প্রবন্ধ, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, দিনহাটা কোচবিহার থেকে প্রকাশিত 'ডুয়ার্সের বনে বাদাড়ে' গ্রন্থে সংকলিত।


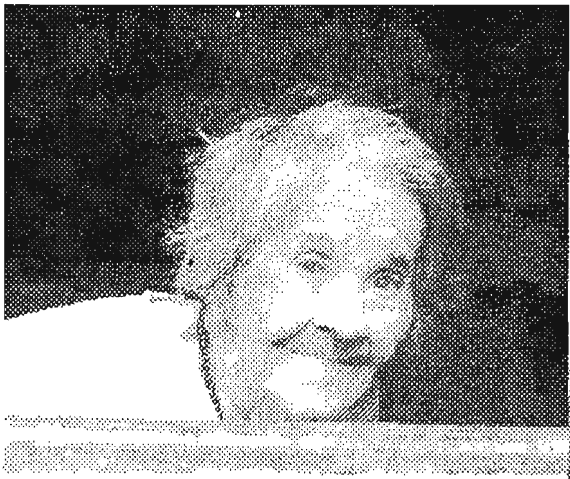

টোটো অতীত আর টোটো ভবিষ্যৎ—বহুস্বরের বহুমাত্রিক মন্থন তাদের মাঝে। (চিত্রগ্রাহক—অরিজিৎ বসু)

# দুইটি টোটো কবিতা ও তাদের বাংলায় ভাষান্তরিত রূপ

মাতৃভাষা

## ধনীরাম টোটোর কবিতা

টোটা ভাষায় : সাইয়ুয়ংকুং

গাইকোয়ং টোটোপাড়াটা
হাওরিকো লংটুল্
তালোংকো ভুটানকো
মসয়া য়াবো
নাতিহিম নোংওয়েরওয়া
য়াবেতো লেরেওয়া
য়াবেকো আরিতা
টিবিকো লই
উইডু-লিডু সকাপা
ওইকো মচুরো
লেকো মচুরো
ইয়ংকো জুপাওয়েপা
সাইয়ুয়ং কুং টোটোপাড়াটা

**বাংলা ভাষান্তর (ধনীরাম টোটোর করা) :**

**টোটোপাড়ার জীবন**

ঘুরতে এসো টোটোপাড়ায়
হাওড়ির নুড়িপাথর
ভুটান পাহাড়ের
দূর ধূসর সবুজ
তোমাকে স্বাগত জানাবে
আর হ্যাঁ
টোটোপাড়ার পাহাড়ে উঠবে
পাহাড়ের ঢালে আমাদের বাড়ি
যেখানে চড়াই উৎরাই
খুব সাবধান
কেন না নীচে নামা সহজ
উপরে ওঠা বড়ো কঠিন
ঠিক টোটোপাড়ায় আমাদের জীবনের মতো

## সত্যজিৎ টোটোর কবিতা

টোটা ভাষায় : লেরেম কোইরো কা

কলকাতা সো দিল্লি হা—জেজেঙওয়া লোকো গা
হিসপা সো চুঙচা কুঙ জেজেঙওয়া—গা
কুঙ লোই লারালা কুঙ লোই...

লেরেম কোই রো কা নুবেইতা তেইওয়া
আটা আজা কো নুনুই হুইমসা
নায়া পোইওয়া তোসা পৌহওয়া হো...হো...

জুপাতা তাদুঙ পুমসা কেইওয়া
টুই মুটুই ব্যাই পুমসা য়াইগোত্র তা তেইওয়া
আটা আজা হিঙপা লিং লাকা ডাইওয়া

লেরেম কোইরো কা য়াইগইকো পুদাঙতা
পিপলা পিওয়া চিঙসাই ও ওয়া
লুনটুই ইমসা কেয়া বিওয়া

**বাংলা ভাষান্তর (সত্যজিৎ টোটোর করা) :**

**ভুলতে পারব না**

হতে পারে কলকাতা বা দিল্লি সুন্দর শহর
আমাদের ভালো লাগে আমাদের গ্রামকে
হিসপা পাহাড়কে বিরাট বনজঙ্গলকে

ভুলতে পারব না আমি নদীতে যাওয়া
ঠাকুরদা ঠাকুরমার পিছু পিছু হেঁটে
মাছ ধরা নদীতে সাঁতার কাটা

পিঠে বস্তা নিয়ে পেরে না পেরে
পাহাড়ে চড়া ঠাকুরদার সাথে
জঙ্গলে কন্দ খোঁড়া

কী করে ভুলতে পারি পাহাড়ের চূড়ায়
পিপলি তোলা বাঁশ কাটা কচু কাটা
পাথর সরিয়ে কাঁকড়া ধরা